সুফী, সুফীসাহিত্য ও সমকালীন ইতিহাস ঃ একটি আলোচনা

প্রদীপ্ত আচার্য

ভারতবর্ষে তুর্কো-আফগান মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হবার সময় থেকেই অনেক সুফী সন্তরা ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুফী ধর্মের বিভিন্ন শাখার যেমন- চিস্তি, কাদরি, সুহারবর্দী, সুরতারী, মাদারি, ফিরদৌসি, নক্সবন্দী ইত্যাদি। সুফীরা অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। কিছু কিছু সুফী সন্তরা যেমন সুহারবর্দী গোষ্ঠীর সুফীরা সম্রাট তথা অন্যান্য শাসকদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু অন্যান্য সুফীরা সম্রাট তথা অন্যান্য শাসকদের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা পচ্ছন্দ করতেন না। সম্রাট কিছু অন্যায় করলে সেটাও সুফীরা পচ্ছন্দ করতেন না। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনসাধারণ সুফীদের কাছে যেতেন বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য। চিস্তি সুফীরা জনসাধারণের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করতেন।

ভারতবর্ষে সুফীদের সম্পর্কে অনেক লিখিত সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া যায়। এই সমস্ত সাহিত্যিক উপাদানগুলির মধ্যে এমন অনেক সংকলনই আছে যেখানে সুফীদের কথা, তাঁদের বাণী, তাঁদের জীবনাদর্শের কথা, তৎকালীন সম্রাটদের কথা এবং সমকালীন বহু ঘটনার কথা জানা যায়। বেশ কিছু সুফী সাহিত্য যেমন, সিয়ার-উল-ওয়ালিয়া, ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ, খোয়ারুল-মজালিস, সকিনা-তুল-ওয়ালিয়া, তস্‌করাতুল-ওয়ালিয়া, খালেহ-পুর্ণেমত, মক্তুবাতে - সদী, তথা মক্তুবাতে দোসদী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে তৎকালীন কিছু উল্লেখযোগ্য সুফীদের জীবন তথা তাঁদের বানী ও তৎকালীন যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি সম্পর্কে একটি আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলিমদের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো কোরাণ এবং হাদিস। এখানে মুহম্মদের বাণী ও মুসলিমদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তারা মুহম্মদের বাণী বা কথা অনুযায়ী সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে ভালবাসেন। তারা তাদের

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু হিজরার প্রায় একশ বছর পর কোরাণ এবং হাদিসের বাহ্যিক ব্যাখায় সন্তুষ্ট না থেকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু মুসলিম নিজেদের আরো গূঢ়, রহস্যমুলক চিন্তাভাবনায় নিয়োজিত করেন। এই আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যের মাধ্যমে তারা আল্লার সঙ্গে নিজেদের এক করতে চেয়েছিল। কিন্তু এর জন্য ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক দিকটিই তাদের কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। তারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে চেয়েছিল এবং তাদের এই প্রচেষ্টার পথ ধরেই ইতিহাসে সুফীবাদের উদ্ভব হয় যা ইতিহাসে তার প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

সুফীবাদ ইসলামের উদ্ভবের প্রায় সমসাময়িক সময় থেকেই উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এমন কি স্বয়ং হজরত মুহম্মদের মধ্যেও এই সুফীবাদের বীজ লুকিয়ে ছিল বলে বলা হয়ে থাকে এবং তা পরবর্তীকালে মুসলিম ধর্মের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাহিত হয়েছিল বলা চলে। "ইল্ম-ই-সিনা" নামক হজরতের রহস্য উদ্ঘাটনের বা কোন বিষয় ব্যক্ত করার এক বিশেষ পদ্ধতি থেকেই সুফীবাদের ধারণা আসে। কারণ এই ইল্ম-ই-সিনা ছিল রহস্যময় বা অতীন্দ্রিয়বাদের আলোচনা যা সুফীরা শিক্ষা নিতেন। সুফীবাদ সত্যের পথ এবং সঠিক পথ-এই ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফীবাদ আল্লার কাছে প্রার্থনা, আল্লার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজন, পার্থিব জগতের মিথ্যা চাকচিক্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা বা ঔদাসীন্যতা, সুখ ও সম্পদ পরিহার, অধিকার পরিহার, দুঃখ বেদনা গ্রহণ, অপরের দুঃখে দুখী হওয়া, মানুষকে সেবা করা, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের দুঃখ মেটানো ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইসলামের অনেক ব্যাখ্যা থেকেই ইসলাম ধর্মে সুফীবাদের যে অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রেই পাপের প্রতি সতকর্তা, চূড়ান্ত বিচারের সময়, নরক যন্ত্রনা ভোগ, কবরে যন্ত্রনা পাওয়ার মতো অনেক কথাই বলা আছে যা মুসলিমদের ভীত করে তুলেছিল এবং তারা পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে, তাদের সম্পত্তি ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে দান করে সর্বস্ব হারিয়ে দুঃখ-দারিদ্র ইত্যাদি গ্রহণের মধ্য দিয়ে গর্ব অনুভব করেছিল। এক কথায় এঁদেরই ইসলামে সুফীবাদের আদিম বাহক বলা যায়।

হজরতের শিষ্যরা খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন এবং তাঁরা আল্লা ও তাঁর বিচারকে ভয় পেতেন। মুহম্মদের সঙ্গী তথা "আহুলস্-সুফা" এর সদস্য আবুদারদা প্রভৃতির কথায় মুসলিমদের বিলাসবর্জিত জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শুধুমাত্র

ঈশ্বর ভীতি ও শাস্তির ভয়েই অনেক মুসলিম বা সুফী তপস্বীররা যোগীরূপ গ্রহণ করতেন বা পার্থিব জগতের প্রতি ঔদাসীন্যতা দেখাতেন তাই-ই নয় এর পিছনে অর্থনৈতিক অবস্থাও দায়ী ছিল। উম্মায়িদ বংশের বংশানুক্রমিক শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু ধর্মীয়, শান্তি প্রিয় ব্যক্তি নিজেদের আল্লার কাছে সঁপে দেওয়ার এবং নিঃসঙ্গতা বা নির্জনতায় বসবাস করার নীতি নেন এবং এইভাবেই একধরনের যোগী বা তপস্বী এবং পার্থিব জগতের সুখ আহ্লাদ থেকে বিরত জীবন ধারার সূত্রপাত হয় যা সুফীবাদ নাম পরিচিত এবং যার কিছু উল্লেখযোগ্য সদস্য ঃ-আবুল-হাসান-অলবাসির আবুজর অল গিফারী এবং হুজাইফাকে ইসলামে সুফীবাদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ বলা যেতে পারে। এছাড়াও এই সময় ইব্রাহিম-বিন আদম ফুজাইল-বিন আয়াজ, বসরার রাবিয়া ইত্যাদি সুফীরা ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফীবাদ মুলত ভালোবাসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফীবাদ ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লার সঙ্গে মানুষকে এক করতে চেয়েছিল এবং এখান থেকেই সুফীবাদের ভালোবাসার নীতি স্থান পায় যা পরবর্তীকালের সুফীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল এবং সুফী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

সুফীরা ও তাঁদের শিষ্যরাও বহু সাহিত্য রচনা করেছিলেন যা থেকে আমরা তৎকালীন ইতিহাসের একাধিক কথা জানতে পারি। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে সুফীবাদের ইতিহাস রচনা করার কাজ খুবই কঠিন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুফী সাহিত্যিক উপাদান কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা অনেক সময় সমকালীন ঐতিহাসিকেরা ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তথা দূরদৃষ্টির অভাবহেতু সুফীদের রচিত সাহিত্যিক উপাদানগুলির গুরুত্ব বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই ভারতে সুফীদের ও তাদের সমকালীন ইতিহাস রচনায় অনেক বিতর্ক আছে। কালের অনিবার্য কষাঘাতে এই সমস্ত লেখাগুলিতেও অনেক পরিবর্তন সাধন বা সংযোজন হয়েছিল অথবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সুফীদের তথা তাঁদের সমকালীন ইতিহাসের সম্যক ধারণা অনেক সময়ই আমরা পাই না তাই তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন এবং ঐতিহাসিক তথ্যের যথার্থতা নির্ণয়ের কাজে মাঝে মধ্যেই ভারতে সুফী ও তাঁদের সমকালীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছু তৎকালীন সুফী সাহিত্যিক উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ-

(১) **সৈয়দ মুহম্মদ বিন মুবারক কিরমানি** এবং আমীর খুর্দ এঁদের লেখা আত্মজীবনীমুলক সাহিত্য "সিয়ার-উল-ওয়ালিয়া"

(২) **মৌলনা-আব্দুল-হক্-দেহলভী** এঁর লেখা " আখবারুল-আখিয়ার" যা থেকে আমরা সুফীবাদের কাদিরিয়া নীতির কথা জানতে পারি।

(৩) **আব্দুল-হাসিম** এবং পীর ইমামুদ্দিন রাজগিরির লেখা "মানাহিজ-উস্-সুত্তার।

(৪) **আব্দুর-রহমান-চিস্তি** এঁর লেখা দুটি সাহিত্যিক গ্রন্থ "(ক) মিরাত-উল-তসরার (খ) মিরাতে মাদারী"

(৫) **মুহম্মদ গেঁউতি-বিন-হাসান-বিন-মুসা-সত্তারি** এঁর লেখা তজকিরাহ্। এটা আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে তাঁর অনুরোধে লেখা এবং জাহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গীকৃত সাহিত্য। এটি ৫টি চমনে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যার প্রথম চমন থেকে হিজরার পরবর্তী সপ্তম শতকে সুফীদের কথা জানা যায়। দ্বিতীয় চমন থেকে অষ্টম শতকের সুফীদের কথা, তৃতীয় চমন থেকে নবম শতকে সুফীদের কথা, চতুর্থ চমন থেকে দশম শতকে এবং পঞ্চম চমন থেকে আমরা সুফীদের সাত্তারিয়া নীতির কথা পাই। এছাড়াও এই গ্রন্থটি থেকে আমরা গুজরাটের ইতিহাস ও ভারতের তৎকালীন ইতিহাস জানতে পারি। এছাড়াও এখান থেকে মুহম্মদীয় ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের কথাও জানা যায়।

(৬) যুবরাজ দারাসিকোর লেখা গ্রন্থ **"সফিনা-তুল-ওয়ালিয়া"**

এই সমস্ত আত্মজীবনীমূলক রচনা ছাড়াও বেশ কিছু মালফুজাত থেকে আমরা ভারতে তৎকালীন সুফীদের এবং তাদের সমসাময়িক ইতিহাসের কথা জানতে পারি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:- (১) **কবি আমীর হাসান সিজ্জি**-এঁর লেখা "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ"।

(২) হামিদ কালান্দার এঁর লেখা "খোয়ারুল মজালিস"।

(৩) **মুহম্মদ কাশিম-বিন-হিন্দুখানের** লেখা "গুলসন-ই-ইব্রাহিমি বা তারিখী ফরিস্তা।

(৪) **মালফুজাত-এ-রুখনি**।

(৫) **আবুল ফজলের আইনী আকবরী** ইত্যাদি রচনা থেকে ভারতে সুফীদের কথা ও সমকালীন ইতিহাস জানা যায়।

এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে অনেক সুফীসন্ত ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু সুফী ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন্ ঃ সেখ হুসেন জঞ্জানি, সেখ আবু তোরাব, সেখ মুহম্মদ, সেখ ইসমাইল ইত্যাদিরা ছিলেন বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য।

সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সুফী ধর্মেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যথা:-

চিস্তি সুহারবর্দী, কাদরি, ফিরদৌসী, নক্সবন্দী ইত্যাদি। এখানে চিস্তি এবং সুহারবর্দী গোষ্ঠীর সুফীদের ও তাদের সমকালীন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হলো।

চিস্তি সম্প্রদায়

খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি

ভারতে চিস্তি সুফীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি। জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে এবং ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে মুহম্মদ ঘুরী উত্তর ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ", "সিয়ারুল-ওয়ালিয়া", প্রভৃতি মালফুজাত ও সাহিত্যিক উপাদান থেকে জানা যায় যে মুহম্মদ ঘুরী উত্তর ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তা চৌহান বংশীয় শাসক পৃথ্বীরাজ চৌহানকে যথেষ্ট ভীত ও শঙ্কিত করে তুলে ছিল। শুধুমাত্র তাঁর কাছে নয়, এই ঘটনাটি দিল্লী ও আজমীরের শাসকের কাছেও অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১খৃঃ) মুহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের হাতে পরাজিত হন, কিন্তু ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। এই সময় খাজা মৈনুদ্দিন মুহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে ভারতে আসেন বলে মনে করা হয়, যদিও এটা নিয়ে বিতর্ক আছে।

মীরখুর্দ এঁর লেখা "সিয়ারুল-ওয়ালিয়া" থেকে জানা যায় যে, পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে হিন্দুরা মুসলিমদের ঘৃণার চোখে দেখতো। এমনকি খাজা মৈনুদ্দিন পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজত্বকালে আজমীরে গেলে তাঁকে খেতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছিল এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দু পুরোহিতগণ তাঁকে আজমীর থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। এটা থেকে বোঝা যায় যে এই সময় মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দুদের যে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন অপবিত্র বলে মনে করা হতো। যদি "সিয়ারুল-ওয়ালিয়া"র লিখিত এই তথ্য সত্য হয় তাহলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খাজা মৈনুদ্দিন পৃথ্বীরাজ চৌহানের জীবিতাবস্থায় ভারতে এসেছিলেন। এছাড়াও আব্দুল হকের লেখা "আখবারুল-আখিয়ার" থেকে তরাইনের যুদ্ধের সময় ভারতে খাজা মৈনুদ্দিনের আগমন সমর্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই সময় খাজা মৈনুদ্দিনের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বাণীতে আকর্ষিত হয়ে অনেক হিন্দু জনগণই মুসলিম ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

খাজা মৈনুদ্দিন জনসাধারণের কাছে খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি শান্তি, একতা ও জনগণের মধ্যে মৈত্রী, সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিতেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মের লোকদের সহানুভূতির চোখে দেখতেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন মনুষ্যত্বের

সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে ধর্ম হলো গরীব দুঃখীদের সেবা করা, তাদের চাওয়া পাওয়ার কথা, তাদের ক্ষুধাকে অনুভব করা অর্থাৎ মানুষকে সেবা করাই হলো প্রকৃত ধর্ম। তিনি তাঁর শিষ্যদের "দিল-দরিয়া" হতে অর্থাৎ নদীর মত বিশাল মনের অধিকারী হতে পরামর্শ দিতেন। তাঁর কাছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনসাধারণ আশীবার্দ গ্রহণ করতেন।

খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী

ইনি ছিলন সুফী ধর্মের চিস্তি সম্প্রদায়ের অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি দিল্লীতে ছিলেন এবং জনসাধারণের কাছে অসম্ভব প্রিয় ছিলেন। তিনি উপনিষদীয় দর্শনে তথা মুহম্মদের চিন্তা ভাবনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও প্রচন্ড জাঁকজঁমকের মধ্যে থাকতেন কিন্তু তিনি কখনোই সরকারী কাজ বা সম্রাটের কাছ থেকে কোন প্রকার উপহার পছন্দ করতেন না। তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের সমসাময়িক ছিলেন। ইলতুৎমিস তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান আধ্যাত্মিক গুরু বলে স্বীকার করতে চাইলেও খাজা কুতুবউদ্দিন সেই পদ গ্রহণ করেন নি। বরং উল্টে সুলতানকে তিনি গরীব দুঃখী জনসাধারণের সেবা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে " ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" প্রভৃতি মালফুজাত থেকে জানা যায়। এই সমস্ত মালফুজাত থেকে এটাও জানা যায় যে, কোনো কারণবশত খাজা কুতুবউদ্দিন দিল্লী থেকে চলে যেতে উদ্যোগী হলে জনসাধারণ তাঁকে বাধা দান করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং সুলতান ইলতুৎমিস। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে খাজা কুতুবউদ্দিন দিল্লীর মেহেরৌলী নামক স্থানে মারা যান এবং এখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। পরে সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর উদ্দেশ্যে কুতুবমিনার করেন বলে মনে কয়া হয়।

বাবা ফরিদউদ্দিনগঞ্জে সকার

ভারতবর্ষে চিস্তি সুফীদের মধ্যে ইনি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতের সুফী ধর্মকে একটি চিরস্থায়ী শক্ত ও বলিষ্ঠ আসন দানের পিছনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাবা ফরিদ কুতুবউদ্দিন বফতিয়ার কাকীর বানীতে বিষেশভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাবা ফরিদউদ্দিন তাঁর শিষ্যদের বলতেন আল্লা সর্বত্রই এবং সবার মধ্যে বিরাজমান। তিনি ছিলেন প্রকৃতই জ্ঞানী এবং তাঁর বাণী শোনার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে রাজনীতিজ্ঞ ইত্যাদি শ্রেণীর প্রচুর লোক আসতেন। তিনি সহজ পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁর দোঁহা রচনা করেছিলেন যা শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আদি গ্রন্থতে পাওয়া যায়।প্রায় ১১২টি মতান্তরে ১৩৪টি দোঁহা এখানে স্থান পেয়েছে বলে মনে করা হয় যা থেকে বোঝা যায় তিনি হিন্দুদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বাবা ফরিদ

বলতেন যে সুফীবাদের মূল পথ হল মনোনিবেশ এবং আল্লাকে আরাধনা করা। দিল্লীর সুলতানীর দুই বিখ্যাত শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এবং সুলতান আলাউদ্দিন খলজী তাঁর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শোনা যায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাবা ফরিদকে চারটি গ্রামে মুক্তা দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি কারণ বাবা ফরিদ বলতেন সরকারী কাজ ও জায়গীর মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণমনা এবং আত্মাকে অপবিত্র করে তোলে। বাবা ফরিদ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন তাঁরা হলেন সাধুসন্ত মানুষ এবং তাঁদের মূল সাধনাই হলো অমর আত্মার উপাসনা ও তাঁর জগতে বিচরণ, কোনো পার্থিব জগৎ নয়। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলন যথেষ্ট উদার এবং উচ্চ-নীচ, সাদা-কালো ভেদে প্রত্যেকেই আল্লার সন্তান বলে তিনি মনে করতেন। তৎকালীন ভক্তি আন্দোলনকারীরাও তাঁর আদর্শের দ্বারা কতকাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ''আসরাউল-ওয়ালিয়া'' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বাবা ফরিদ বাগদাদ, বুখারা, কান্দাহার, গজনী ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং এটাও মনে করা হয় যে বাবা ফরিদ বাংলাদেশের ফরিদপুর নামক স্থানে গিয়েছিলেন এবং এই ''ফরিদপুর'' নামকরণটিও তাঁর নামানুসারে হয়েছিল। যদিও ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'', ''খোয়ারুল-মজালিস'' প্রভৃতি সুফী সাহিত্যিক উপাদান এব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্য প্রদান না করায় যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

সেখ নিজামুদ্দিন-আউলিয়া

চিস্তি সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত সুফী ছিলেন সেখ নিজামুদ্দিন-আউলিয়া। আজুধানে তাঁর সঙ্গে সেখ ফরিদের দেখা হয় যাঁর কথা ও বাণীতে আকৃষ্ঠ হয়ে তিনি চিস্তি সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এক উল্লেখযোগ্য সুফী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন বলে ''সিয়ারুল-ওয়ালিস'', ''ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ'' প্রভৃতি সুফী সাহিত্য থেকে জানা যায়।

''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া'' থেকে জানা যায় যে সেখ নিজামুদ্দিন তাঁর জীবনকালে দিল্লীর সিংহাসনে সাতজন সুলতানের রাজত্বকাল দেখেছিলেন। তবে ''সিয়ারুল-ওয়ালিয়া'' থেকে জানা যায় যে তিনি কোনো সম্রাটের দরবারে যান নি। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের বংশধর কাইকোবাদ কিলুঘেরীতে তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করায় সেখানে লোক সমাগম ঘটতে থাকলে সেখ নিজামুদ্দিন গিয়াতপুর যেতে মনস্থির করেন। কিন্তু পরে তাঁর মতের পরিবর্তন হয়। সুলতান জালালউদ্দিন খলজী সেখ নিজামুদ্দিনের ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়ে তাঁর ''জমায়েতখানা'' (আশ্রম) চালাবার জন্য একটি গ্রাম দান করতে চাইলেও সেখ নিজামুদ্দিন তা নিতে অস্বীকার করেন। এছাড়া সুলতান

আলাউদ্দিন খলজীর সময় কিছু উলেমা সেখ নিজামুদ্দিনের জনপ্রিয়তায় হিংসাবোধ করে আলাউদ্দিনের কানভারী করলে তিনি তাঁর পুত্র খিদির খানকে দিয়ে সেখ নিজামুদ্দিনর বিরুদ্ধে পত্র পাঠালে সেখ বলেন তিনি ফকির এবং রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করার তাঁর কোন ইচ্ছা নেই। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ", "সিয়ারুল-ওয়ালিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সুলতান কুতুবউদ্দিন-মুবারক-খলজী তাঁকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর ছেলে খিদির খানকে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হন। এছাড়াও এই সময় সুলতান মুবারক-খলজী সেখের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য মুলতান থেকে সেখ রুকনুদ্দিনকে নিয়ে আসলেও রুকনুদ্দিনও সেখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

সুলতানি যুগের অপর এক শাসক গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সঙ্গে সেখ নিজামুদ্দিনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। সেখ কর্ত্তৃক অবাধে গরীবদের মধ্যে ধন বিতরণ 'সমা' নামক এক সুফী গানবাজনা শোনার ব্যাপার সহ আরো কিছু বিষয়ে সেখ নিজামুদ্দিনের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল বলে জানা যায় যদিও এই তথ্যের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। সেখ নিজামুদ্দিনের ব্যক্তিত্ত্বের ফলেই সমগ্র ভারতে সুফীবাদ বিকাশিত হয়েছিল বলা চলে। তিনি "রাহাতুল-কুলুব" নামক একটি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেখ নিজামুদ্দিনের সঙ্গে জনসাধারণের ভাল সম্পর্ক ছিল। তাঁর খানকা বিদ্যাচর্চার একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন বহু বিদগ্ধ পন্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে "চিরাগে-দিল্লী' নামে পরিচিত নাসিরউদ্দিন মামুদ, বাংলার আখী সিরাজুদ্দিন উৎমান, দক্ষিণাত্যের বুরহানুদ্দিন গহরিব, "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" এর লেখক আমীর হাসান সিজ্জী ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে সেখ নিজামুদ্দিনের মৃত্যু হয় এবং "সিয়ারুল-ওয়ালিয়া", "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" প্রভৃতি সুফী সাহিত্য থেকে জানা যায় যে সুলতান মুহম্মদ বিন-তুঘলক সেখের কফিন বহন করেছিলেন।

সুহারবর্দী সম্প্রদায়

সেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মূলতানি

সুফী ধর্মের চিস্তি শাখার মতো সুহারবর্দী শাখাও ভারতে সুফী ধর্ম ও সাহিত্যের উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। সুহারবর্দী ভাবধারার প্রবর্তক ছিলেন পারস্যের সেখ শিহাবুদ্দিন সুহারবর্দী। তাঁরই এক উল্লেখযোগ্য শিষ্য সেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মূলতানি ভারতে সুহারবর্দী ভাবধারা বহন করে নিয়ে আসেন। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া বাগদাদে

সেখ শিহাবুদ্দিন সুহারবর্দীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেখ শিহাবুদ্দিন বাহাউদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে "খিরকা-এ-খিলাফত" বা আল্লার হয়ে ধর্ম প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে মূলতান ও ভারতে সুহারবর্দী ভাবধারা প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। "'আখবারুল-আখিয়ার" নামক সুফী সাহিত্য থেকে জানা যায় যে ভারতে সুফীরা প্রথমে সেখ বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করলেও পরে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন। তাঁর খানকায় তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রচুর লোক সমাগম হতো এবং এঁদের অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তাঁর বানী খুব শীঘ্রই সিন্ধু, মুলতান, বালুচিস্তান ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ছড়িয়ে পরেছিল।

সেখ বাহাউদ্দিন ভারতে পর পর আট জন মামেলুক সুলতানের রাজত্বকাল দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি অনেক সুলতানের ও সরকারী কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে মূলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দিন কুবাচা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান এবং ইলতুৎমিস তাঁকে "সেখ-উল-ইসলাম" নামক পদ দান করেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের সময় মোঙ্গলরা তাদের মূলতান আক্রমণের মাধ্যমে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং দ্বিতীয়বার তাদের মূলতান অভিযানকালে সেখ বাহাউদ্দিন স্বয়ং মোঙ্গলদের কাছে যান এবং ১ লক্ষ দিরহাম অর্থদানের মাধ্যমে মোঙ্গলদের মূলতান আক্রমণ থেকে বিরত করেন। "ফুয়ায়েদ-উল-ফুয়াদ" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেখ বাহাউদ্দিন নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা না করলেও নিম্ন শ্রেণীর তথা সাধারণ লোকের দুঃখ দারিদ্রে প্রচুর অর্থ দিয়ে এবং কখনো কখনো সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাহায্য করতেন। এছাড়াও মুলতানে একবার দুর্ভিক্ষ হলে তিনি প্রচুর অর্থ দিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখ বাহাউদ্দিন শ্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং চাষবাস, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকে রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মনে করতেন। তিনি কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য জঙ্গল জমি কেটে উর্বর ক্ষেত্র তৈরী এবং মূলতানের জলধারা, কুয়ো ও নদনদীগুলির সংস্কারের উপর জোর দিয়েছিলেন যা থেকে তাঁর সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। যাইহোক তৈমূরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ফলে যে প্রচুর পরিমাণে সুফীদের জীবন হানি হয়েছিল তার ফলে ভারতে সুহারবর্দী গোষ্ঠীর সুফীদের প্রভাব কমে যায়, যদিও জালালউদ্দিন-তাব্রেজী বাংলায় সুহারবর্দী ভাবধারার প্রচার করেছিলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে যত সুফী সাহিত্য আছে যেমন ফুয়ায়েদ-উল-

ফুয়াদ, খোয়ারুল মজালিস ইত্যাদি থেকে আমরা ভারতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সুফী তথা তাঁদের কার্যকলাপের এবং সমকালীন ইতিহাসের একটি চিত্র পাই। এর থেকে দেখা যায় যে, এই সমস্ত সুফী সাহিত্যগুলি শুধুমাত্র প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গুণাবলীর ইতিহাসই নয় - এখান থেকে তৎকালীন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদিরও কথা জানতে পারি। সুতরাং যদি এই সমস্ত উপাদানগুলি খুব সচেতনভাবে অনুধাবন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত উপেক্ষিত সাহিত্যিক উপাদানগুলি থেকেও আমরা তৎকালীন যুগের বিভিন্ন ঐতাহাসিক তথ্য পাই - যা আমাদের পুনরায় ভাবিয়ে তোলে এবং এটাই প্রমাণ করে যে এই সমস্ত উপাদানগুলিকে পুনরায় ইতিহাসের এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন আছে।